দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৯/৭/৮২
পৃষ্ঠা

121

সাক্ষরতা অভিযান

প্রসঙ্গ / রেজোয়ান সিদ্দিকী

অশিক্ষা, দারিদ্র্য আর শোষণে হাজার বছর ধরে বঞ্চিত লাঞ্ছিত বাংলাদেশের মানুষ। এই দীর্ঘকাল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই এদেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সামন্ত সমাজব্যবস্থা গেছে ভেঙে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। মানুষের জন্য কায়েম হয়েছে ভোটাধিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে দেশে। কিন্তু মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হয়নি। কৃষিতে পরিবর্তন ঘটেনি, চাষাবাদ পদ্ধতিতে আসেনি আমূল কোনো পরিবর্তন। ফলে বাংলাদেশের গ্রাম জীবন আছে স্থির হয়ে কোটি মানুষের ভাগ্যে ঘটেনি কোনো পরিবর্তন। শাসক বদল হয়েছে বারবার শোষণের অবসান হয়নি। বারবার বিভ্রান্ত হয়েছেন আমাদের নিরক্ষর জনসাধারণ।

যুগ যুগ ধরে শোষণে অভ্যস্ত আমাদের মানুষ। সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্দশার জন্য তারা দায়ী করেন ভাগ্যকে। আমাদের নিরক্ষর আর কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ শত বছরেও জানতে পারেননি, তাদের শোষক কারা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঞ্চিত থাকার পেছনে আছে কাদের কালো হাত। তারা জানেননি এই বঞ্চনা অবসানের উপায় কি।

এর প্রধান কারণ নিরক্ষরতা। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, শাসন ক্ষমতায় যিনিই এসেছেন, তিনি স্থায়ী শোষণ কায়েমের স্বার্থে নিরক্ষরতা অব্যাহত রাখারই ব্যবস্থা করেছেন বরং। আমাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রসারিত হয়নি শিক্ষা।

এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এসেছিল পাকিস্তান, এসেছে বাংলাদেশ।

শিক্ষার সমস্যা বহুবিধ। একদিকে ব্যাপক ভিত্তিতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ যেমন বারবার হয় বাধাগ্রস্ত, তেমনি আছে শিক্ষা-উপকরণের দুর্মূল্য। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাও সে কারণে অনগ্রসর। দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে যে শিশু ভর্তি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই তাদের অনেককে ছেড়ে দিতে হয় পড়াশোনা। হয়তো অ আ ক খ শেখে, তারপর ভুলে যায় বর্ণমালা। এই প্রক্রিয়ার ভেতরে প্রাথমিক স্কুল পার হয়ে আসে কিছু ছাত্র, হাইস্কুল পার হয় কয়েকজন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারে দু-একজন ভাগ্যবান-বিত্তবান। ফলে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়েই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একারণে বয়স্ক শিক্ষা থাকে আরও পেছনে, এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণেই কেটে যায় দীর্ঘ সময়।

অথচ একটি সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজন অধিক সংখ্যক সাক্ষর মানুষ। যে মানুষ খবরের কাগজ পড়ে, বেতার–টিভি দেখে বুঝতে পারেন, যে মানুষ জমিতে ফসল বুনতে গিয়ে ঠিক করতে পারেন উপযুক্ত মওসুম, দিনক্ষণ, যিনি নির্ধারণ করতে পারেন বীজ বা সারের পরিমাণ। যিনি নির্ধারণ করতে পারেন রাজনৈতিক নেতাদের কথা ও কাজের ফারাক। যাতে স্লোগানে বিভ্রান্ত করা না যায় সাধারণ মানুষকে। মানুষের কাছে যেন কাজ নিয়ে কর্মসূচী নিয়ে যেতে হয় রাজনীতিকদের।

ক্ষমতাসীন হয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, তিনি স্লোগানের রাজনীতির অবসান ঘটাতে চান। তারই অংশ হিসেবে খাদ্যে আত্মনির্ভরতা অর্জনের শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মসূচী। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল বছরে এক কোটি মানুষ সাক্ষর করে তোলার।

সেই উদ্যোগ অগ্রসর হয়েছিল। এই উদ্যোগের সমালোচনা হয়েছে। যারা বিরোধিতার জন্য যে-কোনো উদ্যোগকেই বিরোধিতা করার লক্ষ্য ঠিক করেছেন, তারা বলেছেন বহু কথা। অনেকেই বলেছেন, কাগজের মূল্যবৃদ্ধির কথা, পাঠ্যপুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতার কথা বলেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতির কথা। এর কোনো কোনো বিষয় নিঃসন্দেহে গণশিক্ষার উদ্যোগের জন্য সহায়ক ছিল না। কিন্তু গণশিক্ষার এ উদ্যোগে কোথায়ও কোথায়ও সত্যি সত্যি সাড়া পাওয়া গেছে। কোথায়ও কোথায়ও সত্যি সত্যি গোটা গ্রামের মানুষ অক্ষরজ্ঞান অর্জন করেছেন। কোথায়ও কোথায়ও সাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চারও হয়েছিল। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সেই উদ্যোগের ফলে দেশের কয়েক লক্ষ মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ করেছেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে গণশিক্ষার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত ছিল পঞ্চাশ নম্বর। এর সমালোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের ওপর বোঝা হয়ে গিয়েছে এই কর্মসূচী। দেশের প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, সাক্ষর করে তোলার লোক পাবে কোথায় ছাত্ররা। এর নাম বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, দেশের গ্রামাঞ্চলে এই উদ্যোগের ফলে সাক্ষর হয়েছেন বহু লোক। এখনও অ আ ক খ শিক্ষার জন্য অনেক বৃদ্ধ আগ্রহী আছেন। গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য জিয়া সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। গণশিক্ষার জন্য গঠন করা হয়েছে আলাদা পরিদপ্তর। ছাপা হয়েছিল কয়েক লক্ষ সাক্ষরতা গ্রন্থ। তা বিতরণও করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। গঠিত হয়েছিল গণশিক্ষা কমিটি। সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। সম্ভবত এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের ঋণ নিতে নাম সই করা বাধ্যতামূলক। তেমনিভাবে নিয়ম করা যায় যে কোনো কল-কারখানায় শ্রমিক বেতন নেবেন তার নাম সই করে।

গণশিক্ষা কর্মসূচী হয়ত তার বার্ষিক লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তার আংশিক সাফল্যও আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। তবে সেই উদ্যোগ কি এখন শিথিল হয়ে পড়েছে? সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

পক্ষে কি নতুন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? কিন্তু দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সেই উদ্যোগের ভেতরে ব্যাপক উৎসাহ সঞ্চার প্রয়োজন।

আমরা আশা করি মরহুম জিয়া সূচিত এই সাক্ষরতা অভিযানে উপযুক্ত গুরুত্ব দেবেন তার উত্তরাধিকারী সরকার।